নয়া সামাজিক আন্দোলন
(New Social Movements)

যখন জনসাধারণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কোনো মতাদর্শ বা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমষ্টিগত নেতৃত্বের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করার জন্য বা বিদ্যমান ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন তা সামাজিক আন্দোলন রূপে বিবেচিত হয়। সাধারণভাবে সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিবর্তনের ধারণাটি যুক্ত। কিন্তু ঘনশ্যাম শা (Ghanshyam Shah)-র মতে সামাজিক আন্দোলন হল "Collective efforts to promote/resist change." এম.এস.এ. রাও (M.S.A. Rao) তাঁর *Social Movement in India* পুস্তকে বলেছেন যে, সামাজিক আন্দোলন হল প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবর্তনের এক সংঘবদ্ধ প্রয়াস। সামাজিক আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল: ১) যৌথ উদ্দেশ্য (collective goal), ২) সমষ্টিগত মতাদর্শ (collective ideology), ন্যূনতম সাংগঠনিক ভিত্তি (minimal degree of organization) এবং নেতৃত্ব (leadership)। Andrew Heywood তাঁর *Politics* গ্রন্থে বলেছেন, "A social movement is a particular form of collective behaviour in which the motive to act springs largely from the attitudes and aspirations of members, typically acting within a loose organizational framework." এম.এস.এ. রাও তিন ধরনের সামাজিক আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন: ১) সংস্কারপন্থী (Reformative), ২) রূপান্তরকামী (Transformative) ও ৩) বিপ্লবাত্মক (Revolutionary)।

সাবেকি সামাজিক আন্দোলন থেকে নব্য বা নয়া সামাজিক আন্দোলন (New Social Movement বা NSM) ভিন্ন প্রকৃতির। অধ্যাপক অশোককুমার সরকার তাঁর *সংসদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান* গ্রন্থে বলেছেন যে, সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত নানাবিধ সামাজিক

Scanned with CamScanner

আন্দোলনকে নব্য সামাজিক আন্দোলন বলা হয়। চিরায়ত সামাজিক আন্দোলনের মতো নব্য সামাজিক আন্দোলনও নিরবচ্ছিন্ন সংঘটিত যৌথ কর্মপ্রতিক্রিয়া (sustained organized collective action)। এই আন্দোলনও প্রধানত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চালিত হয় যাতে সামাজিক স্বার্থে নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ফ্রাংকফুর্ট স্কুলের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক য়ুর্গেন হাবেরমাস (Jurgen Habermas) মনে করেন যে, নব্য সামাজিক আন্দোলনে শ্রেণি বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। অধ্যাপক অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, নয়া সামাজিক আন্দোলনের ধারণাটি মূলত পশ্চিম ইউরোপকেন্দ্রিক। নয়া সামাজিক আন্দোলন হল সেই সকল আন্দোলন যা পূর্বে প্রচলিত শ্রমিক আন্দোলন থেকে পৃথক। নয়া সামাজিক আন্দোলনের কোনো শ্রেণিভিত্তি নেই বরং এই আন্দোলন সামাজিক প্রকৃতির। এই আন্দোলন মূলত মানবতাবাদী, সংস্কৃতি ও অবস্তুবাদী বা post material আন্দোলন। অধ্যাপক হে'উড সাবেকি সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে নয়া সামাজিক আন্দোলনের চারটি পার্থক্যের কথা বলেছেন—

১। সাবেকি সামাজিক আন্দোলন চালিত হত মূলত শোষিত, নিপীড়িত ও সামাজিক দিক থেকে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের দ্বারা। অন্যদিকে নয়া সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকেন উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়।

২। সাবেকি আন্দোলনে সামাজিক উন্নয়ন বা কোনো বস্তুগত স্বার্থের ওপর জোর দেওয়া হত, পক্ষান্তরে নয়া সামাজিক আন্দোলনগুলির একটি 'post material orientation' বা অবস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ আছে (তবে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একথা সর্বদা প্রযোজ্য নয়)। অন্যভাবে বলতে গেলে নয়া সামাজিক আন্দোলনে 'politics of interest' অপেক্ষা 'politics of identity'র ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩। সাবেকি আন্দোলনগুলির অভিন্ন মতাদর্শ থাকত না; কিন্তু 'common ideology' বা অভিন্ন মতাদর্শ NSM-এর একটি বৈশিষ্ট্য।

৪। NSM-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (participatory decision making)। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বাইরে তারা কাজ করতে পছন্দ করে।

Oxford Dictionary of Sociology-তে John Scott-এর একটি বক্তব্য দিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করব। Scott বলেছেন, "(A social movement) in an organized effort by a significant number of people to change (or resist change) in some major aspect or aspects of society ... NSMs (New Social Movements), in the latter decades of the 20th century became an

Scanned with CamScanner

increasingly important source of political change." তিনি আরও বলেছেন, "Social movements are one of the basic elements of a living democracy ..." অর্থাৎ জীবন্ত গণতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান হল সামাজিক আন্দোলন এবং NSMগুলি রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

নয়া সামাজিক আন্দোলনগুলির মধ্যে তিনটি আন্দোলন আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত— ১) পরিবেশ আন্দোলন (Environment movement), ২) নারী আন্দোলন (Women's movement) এবং ৩) মানবাধিকার আন্দোলন (Human Rights movement)।

পরিবেশ আন্দোলন
(Environment Movement)

ক্ষণভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে মানবজাতি আজ সচেতন। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত 'বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন' (Earth Summit), ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন (Brundtland Commission)-এর রিপোর্ট, Kyoto Protocol, রাষ্ট্রসংঘের Sustainable Development Goals (SDG) সংক্রান্ত ঘোষণা প্রভৃতি মানবজাতিকে পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন করেছে। ভারতেও পরিবেশ সম্পর্কিত নানা আইন এ-পর্যন্ত প্রণীত হয়েছে। Brundtland Report for the World Commission on Environment and Development (১৯৮৭)তে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন বা 'sustainable development'-এর সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে, "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." সোজা ভাষায় ভবিষ্যত প্রজন্মের পরিবেশগত চাহিদা মাথায় রেখে আমাদের বর্তমান চাহিদাকে মেটানো। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ভারতে প্রশাসনিক, আইনি, বিচারবিভাগীয় নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও এ বিষয়ে সক্রিয়। অধ্যাপক রাখহরি চ্যাটার্জী সম্পাদিত *Politics India* গ্রন্থে 'Environment and Politics in India' শীর্ষক একটি নিবন্ধে অধ্যাপক সত্যব্রত চক্রবর্তী এইসব সংস্থাগুলির কাজকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন: ১) শিক্ষামূলক, ২) উন্নয়নমূলক এবং ৩) প্রতিরোধমূলক।

১৯৮৪ সালে ভূপালে Union Carbide-এর কারখানা থেকে MIC গ্যাস নির্গত হয়ে ২৫০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারান। এরকম বিপর্যয় বোধ হয় আর ঘটেনি। এই দুর্ঘটনার ফলে একদিকে যেমন সরকারি তরফে শিল্পদূষণ এবং তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নানান

Scanned with CamScanner

পদক্ষেপ গৃহীত হয়— বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়, তেমনি সাধারণ মানুষও ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের বিপদ এবং তার ভয়াবহতার দিকটি প্রত্যক্ষ করে। ভূপাল দুর্ঘটনার ফলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পরিবেশ সচেতনতা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৮৬ সালে 'পরিবেশ (রক্ষা) আইন' প্রণয়ন করা ছাড়াও ১৯৯২ সালের জুন মাসে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবেশ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় সংরক্ষণ নীতি প্রকাশ করেন। এই নীতিতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মূল চাহিদাগুলি পূরণের জন্য পরিবেশের ক্ষতি না করে কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে, সে ব্যাপারে নীতি ও কৌশলের কথা বলা হয়েছিল।

পরিবেশ আন্দোলনসমূহের শ্রেণিবিভাগ করা যায়, যেমন— গান্ধীবাদী, মার্কসবাদী, বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণবাদী প্রযুক্তিবিদদের মতাদর্শভিত্তিক ইত্যাদি। বাস্তবে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মতাদর্শগত অবস্থানগুলি পরস্পর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সেগুলির মধ্যে যে বিভাজনরেখা তা কিছুটা অস্পষ্ট।

বেসরকারি সংস্থাগুলি (NGOs) অনেক সময়ে পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা ও দূষণ রোধের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে। যেমন— কেরালা জনগণের বিজ্ঞান আন্দোলন (Kerala People's Science Movement – KPSM)। এরূপ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' (Sustainable Development) ধারণাটি জনপ্রিয় করে তোলা। কেরালার এই বেসরকারি সংস্থাটি পদযাত্রার আয়োজন করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু বেসরকারি সংগঠন আবার আদালতে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা করে পরিবেশ-প্রতিকূল সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়।

১৯৯৫ সালে 'জাতীয় পরিবেশ (ট্রাইবুনাল) আইন' পাস করা হয়। যার মাধ্যমে একটি জাতীয় ট্রাইবুনাল গঠনের পাশাপাশি দ্রুত পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের চারটি প্রধান শহরে এর শাখা স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের জেলাস্তরে 'পর্যাবরণ বাহিনী' গঠন করা হয়েছে পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশ ধ্বংসের হাত থেকে ওইসব অঞ্চলকে রক্ষা করবার জন্য। শিল্প দূষণ রোধ করার জন্য দূষণ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন শিল্পকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের বাধ্য করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের বিচার বিভাগ বিভিন্ন সময়ে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগের বদান্যতায় ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত 'জীবনের অধিকার' (২১ নম্বর ধারা)-এর পরিধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 'দূষণ মুক্ত পরিবেশে জীবন ধারণের অধিকার'। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি হাইকোর্টে

Scanned with CamScanner

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য 'গ্রীন বেঞ্চ' (Green Bench) স্থাপন করা হয়েছে। সবুজ ধ্বংস করা, জলাভূমি বুজিয়ে ফেলা, শব্দদূষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি 'গ্রীন বেঞ্চে'র এক্তিয়ারে পড়ে। কোর্টের নির্দেশে বিভিন্ন দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথবা জনবসতির থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিচারালয়ের হস্তক্ষেপের ফলেই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্জ্য পদার্থ শোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। ঐতিহাসিক তাজমহলকে দূষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মথুরা তেল শোধনাগারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। শব্দদূষণ রোধে বিশেষত উৎসবের সময় পটকার আওয়াজ এবং মাইক্রোফোনের অত্যাচারের হাত থেকে শহরবাসীকে কিছুটা অন্তত রেহাই দেবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (Pollution Control Boards) গঠন করা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে একদিকে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবামূলক সংস্থাগুলির নিরলস প্রয়াস আর অন্যদিকে সরকারের উদাসীনতা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল নানা প্রতিরোধমূলক আচরণ আর সেগুলি থেকেই জন্ম নিল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন।

পরিবেশ আন্দোলনগুলির মূল বিষয়বস্তু হল— "প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক।" সংক্ষেপে এই আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য হল— ক) প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যাতে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, খ) উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, গ) সরকারি ও বেসরকারি সেইসব কর্মসূচির বিরোধিতা করা যেগুলির প্রভাব পরিবেশ প্রতিকূলতা বৃদ্ধি করে এবং ঘ) পরিবেশ অবক্ষয় রোধ করার জন্য কিছু বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যাতে সাবেকি পরিবেশ হানিকর প্রথাগুলি বর্জন করা সম্ভব হয়। রামচন্দ্র গুহ এবং মাধব গ্যাডগিল পরিবেশ আন্দোলনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এগুলি হল সেইসব সংগঠিত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ যেগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী করা, পরিবেশ অবক্ষয় রোধ করা অথবা পরিবেশ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ সচেতনতার সঙ্গে গৃহীত হয়। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্দনা শিবা মনে করেন যে, উন্নয়নের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির লুণ্ঠনমূলক শোষণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতে বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে বাজার অর্থনীতির দুর্নিবার চাপ ও অন্যদিকে দ্রুত উন্নয়নের তাগিদ— এই দুই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষেরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

২৬। চিপকো আন্দোলনের উপর টীকা লেখ?

=> আভিধানিক অর্থে 'চিপকো' শব্দটি জড়িয়ে ধরা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই আন্দোলনের নামকরণ মূলত কিছু গ্রামবাসীদের গাছকে জড়িয়ে ধরার এক প্রানপন প্রয়াস থেকে হয়েছে।

'চিপকো আন্দোলন' গাড়োয়াল হিমালয়ে মূলত সংঘটিত হয়েছিল যদিও তার প্রভাব প্রত্যন্ত হিমালয়ের মধ্যে সীমিত ছিল না। এই আন্দোলনের মূলে ছিল এই অঞ্চলের অত্যন্ত সমৃদ্ধ বনভূমিকে বানিজ্যিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা। 1970 এর দশকে এই আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারন করে এবং সরকার এই আন্দোলনগুলির দাবী মানতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মীরা বেহেন, সুন্দরলাল বহুগুনা প্রমুখের কথা বলা যায়।

'চিপকো আন্দোলন'এর গুরুত্ব অচিরেই প্রত্যন্ত হিমালয়ে পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে সীমানা ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল —

প্রথমত, এই আন্দোলন ইকো-ফেমিনিজমের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত বলা যায়। আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষন করলে বলা যায় এখানে একদিকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, যা অরন্য ছেদনকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে, অন্যদিকে অরন্য সংরক্ষন দাবীতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি যা অরন্যকে বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম স্বরূপ প্রতিবাদ গড়ে তোলে। ফলত অনেক সময়েই একই পরিবারের পুরুষ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে অরন্য নিয়ে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন ছিল মূলত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মহিলাদেরই আন্দোলন। এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল এটি সাধারন মানুষের সম্পূর্ন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাধারন মহিলারা স্বতঃ প্রনোদিত হয়ে অরন্য বাঁচানোর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তৃতীয়ত, এই আন্দোলনের সেই অর্থে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সাংগঠনিক দিক ছিল না, কোন রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি বা সাধারন মানুষকে সংগঠিত করেনি। বরং সাধারন মানুষ অনেকটা স্বেচ্চায় এই আন্দোলনে সামিল হয়।

চতুর্থত, এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ন শান্তিপূর্ন আন্দোলন। আন্দোলনকারীরা কোন রকম বাহ্যিক প্ররোচনায় পা দেননি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সত্যাগ্রহ, আমরন অনশন, গীতার শ্লোক পাঠ, পূজা-অর্চা করা, রাখীবন্ধন ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

3. পরিবেশ কীভাবে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক বা পরিবেশ ও রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?

⇒ সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হতে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, মানুষের পারিপার্শ্বিক উপাদানসমূহ অর্থাৎ মাটি, জল, মাটি, বায়ু, অন্যান্য জীব ও উপাদানকে পরিবেশ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। মানুষকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে হয়। পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবজাতি ও সভ্যতার অগ্রগতি ঘটে। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ইতিবাচক ফল বহন করে না। অন্যদিকে পরিবেশকে অপরিমিত ব্যবহারের ফলে পরিবেশের সংকট ও দূষণ ঘটে থাকে। বর্তমান যুগে দূষণমুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাতিপুঞ্জ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুতরাং পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা রাষ্ট্র ও রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এবং বিচারবিভাগ দূষণমুক্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। একই সঙ্গে দেশের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ এবং বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়, যা পরোক্ষভাবে পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। পুনরায় রাষ্ট্র নিজে বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় জনসমাজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। দেশের মধ্যে গণ আন্দোলন এবং জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা উত্থাপিত হয়। এইভাবে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় মানুষ জাতি, উপজাতি পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সরকার ও বিচারবিভাগকে এই দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয় এবং আইন প্রণয়ন করতে হয়। এদিক থেকে বলা যায় যে পরিবেশ ও রাজনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

4. র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ - এর উপর টীকা লেখ?

⇒ নারীবাদ একটি নতুন ধারণা যার সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর ষাট বা সত্তরের দশকে। 'The Vindication of the Rights of Women (1792)' গ্রন্থের রচয়িতা মেরি উলস্টোনক্রাফটকে অনেকে নারীবাদের জনক হিসাবে আখ্যা দেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সত্তরের দশকের পর থেকে যে নারীবাদী আন্দোলনগুলি হয়েছে সেগুলি আগের আন্দোলনগুলি থেকে পৃথক ছিল। এই আন্দোলনের ধারাগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় — (ক) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ, (খ) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, (গ) উদারনৈতিক নারীবাদ।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মনে করেন নারী নির্যাতন ও যৌন পীড়নের মূল কারণটি জৈবিক। সাইমন দ্য বোভোয়ার ~~নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যের~~, ব্রাউনমিলার, কেট-মিলেট এঁরা এই মতবাদ সমর্থন করেন। এরা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যের কারণ হিসাবে জৈবিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণকে গুরুত্ব দেন। এরা বলেন শৈশব থেকে সমাজে মানুষের উপর যে সামাজিকীকরণ কার্যকর হয় তা লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

বৈশিষ্ট্য:- প্রথমত, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মহিলাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ধারণাসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বা কর্মসূচীর সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে এই নারীবাদ কোনোরকম তাগিদ অনুভব করে না, কারণ র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ হল মহিলাদের, মহিলাদের দ্বারা এবং মহিলাদের জন্য একটি মতবাদ।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে মহিলাদের উপর পীড়নকে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একটি বিশ্বজনীন ও মৌলিক প্রকৃতির উপায় হিসাবে দেখা হয়। এই মতবাদের উদ্দেশ্য হল এই পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যকে অনুধাবন করা এবং এর অবসানকে সুনিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত, এই মতবাদ অনুযায়ী মহিলারা হল একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। মহিলাদের এই ঐক্য ও সহমর্মিতা জাতি ও শ্রেণীগত বিভাজনকে অতিক্রম করে যায়। এই মতবাদে বলা হয় যে, নিজেদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

চতুর্থত, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদে রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে কেবলমাত্র সর্বসাধারণের ক্ষেত্রেই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়; পরিবার ও লিঙ্গগত সম্পর্কের মত জীবনে ব্যক্তিগত এলাকায় ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। পরিবার এবং লিঙ্গগত সম্পর্ক এই দুটি বিষয় পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়।

মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি হয় যে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের মাধ্যমে নারীসমাজের বক্তব্য সমূহের সম্যক অভিব্যক্তি ঘটেছে সাবেকি মতবাদ সমূহের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়নি। নারীবাদীর এই সমস্ত নতুন চিন্তা চেতনা জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশ কিছু সমাজবিজ্ঞানীর রচনাসমূহের মাধ্যমে, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল জারমেইন গ্রীয়ার প্রণীত - 'The female Eunuch (1970)' কেট মিলেট প্রণীত - 'Sextual politics' প্রভৃতি গ্রন্থ।

Scanned with CamScanner

১০.২ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নারী আন্দোলন ঃ—
(Post Independence Women's Movements)

ভারতীয় সংবিধান রচনা করার সময় গণপরিষদের সদস্যরা পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকার দানের প্রয়োজনীয়তা এবং মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করেছেন, যেমন—(১) সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই সবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতার সংকল্প ঘোষণা করা হোয়েছে। (২) বিভিন্ন মৌলিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা হোয়েছে। (৩) নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে বলা হোয়েছে যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার ভোগ করবে এবং একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমান মজুরী পাওয়ার কথা বলা হোয়েছে। (৪) মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সব প্রথাকে পরিহার করার কথা বলা হোয়েছে। (৫) সর্বোপরি, ভোটাধিকার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ব্যবস্থা করা হোয়েছে।

উপরোক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়া নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি সামাজিক আইন প্রণীত হয়, যেমন— (ক) ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন, (খ) ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন, (গ) ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন , (ঘ) ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, (ঙ) ১৯৭৬ সালের সমমজুরী আইন ইত্যাদি।

স্বাধীন ভারতের প্রথম কয়েকটি বছর নারী স্বার্থরক্ষার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অনেক সময় মহিলাদের সাংসারিক কাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। মহিলাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। অভ্যন্তরীণ মতদ্বন্দ্বের জন্য প্রধান মহিলা সংস্থা All India Women's Conference (AIWC) এই সময় কিছুটা নিষ্ক্রিয় হোয়ে যায়। এই কারণেই অপর্ণা মাহাতো এই কয়েকটি বছরকে ধূসর (grey) বলে অভিহিত করেছেন। পঞ্চাশের দশক থেকে মহিলা সংগঠনগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে থাকে। এই সংগঠনগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়— (ক) কাঠামোর দিক থেকে সংগঠনগুলি ছিল হয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত অথবা স্বশাসিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা গোষ্ঠী এবং (খ) বিষয় বা সমস্যাভিত্তিক গোষ্ঠী যাদের উদ্দেশ্য ছিল মহিলা সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নারী আন্দোলন বহুবিভক্ত হোয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রথমে ১৯৫৪ সালে বামপন্থী সদস্যরা AIWC ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে National Federation of Indian Women (NFIW) গঠন করেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন— মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির All India Democratic Women's Association (AIDWA), জনতা দলের মহিলা দক্ষতা সমিতি, ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা ইত্যাদি। ঐতিহাসিক সূত্রে কংগ্রেস দলের সঙ্গে জড়িত ছিল AIWC।

ভারতে নারী-আন্দোলনের গবেষকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন সত্তরের দশকটি হোল নারী-আন্দোলনের পুনর্জাগরণের পর্ব। এই সময় স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যাকে ঘিরে এবং আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের অংশ হিসাবে নানা আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত মহিলা

Scanned with CamScanner

১০.২ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নারী আন্দোলন ঃ—
(Post Independence Women's Movements)

ভারতীয় সংবিধান রচনা করার সময় গণপরিষদের সদস্যরা পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকার দানের প্রয়োজনীয়তা এবং মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করেছেন, যেমন—(১) সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই সবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতার সংকল্প ঘোষণা করা হোয়েছে। (২) বিভিন্ন মৌলিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা হোয়েছে। (৩) নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে বলা হোয়েছে যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার ভোগ করবে এবং একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমান মজুরী পাওয়ার কথা বলা হোয়েছে। (৪) মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সব প্রথাকে পরিহার করার কথা বলা হোয়েছে। (৫) সর্বোপরি, ভোটাধিকার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ব্যবস্থা করা হোয়েছে।

উপরোক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়া নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি সামাজিক আইন প্রণীত হয়, যেমন— (ক) ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন, (খ) ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন, (গ) ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন , (ঘ) ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, (ঙ) ১৯৭৬ সালের সমমজুরী আইন ইত্যাদি।

স্বাধীন ভারতের প্রথম কয়েকটি বছর নারী স্বার্থরক্ষার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অনেক সময় মহিলাদের সাংসারিক কাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। মহিলাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। অভ্যন্তরীণ মতদ্বন্দ্বের জন্য প্রধান মহিলা সংস্থা All India Women's Conference (AIWC) এই সময় কিছুটা নিষ্ক্রিয় হোয়ে যায়। এই কারণেই অপর্ণা মাহাতো এই কয়েকটি বছরকে ধূসর (grey) বলে অভিহিত করেছেন। পঞ্চাশের দশক থেকে মহিলা সংগঠনগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে থাকে। এই সংগঠনগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়— (ক) কাঠামোর দিক থেকে সংগঠনগুলি ছিল হয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত অথবা স্বশাসিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা গোষ্ঠী এবং (খ) বিষয় বা সমস্যাভিত্তিক গোষ্ঠী যাদের উদ্দেশ্য ছিল মহিলা সংক্রান্ত বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নারী আন্দোলন বহুবিভক্ত হোয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রথমে ১৯৫৪সালে বামপন্থী সদস্যরা AIWC ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে National Federation of Indian Women (NFIW) গঠন করেন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে, যেমন— মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির All India Democratic Women's Association (AIDWA), জনতা দলের মহিলা দক্ষতা সমিতি, ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা ইত্যাদি। ঐতিহাসিক সূত্রে কংগ্রেস দলের সঙ্গে জড়িত ছিল AIWC।

ভারতে নারী-আন্দোলনের গবেষকদের মধ্যে অনেকে মনে করেন সত্তরের দশকটি হোল নারী-আন্দোলনের পুনর্জাগরণের পর্ব। এই সময় স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যাকে ঘিরে এবং আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের অংশ হিসাবে নানা আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত মহিলা

Scanned with CamScanner

সংগঠনগুলি ছাড়া বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই সময়ে স্থাপিত হয়, যেমন— সহেলী, সমতা মঞ্চ, স্ত্রী, সংঘর্ষ সমিতি, স্বনিযুক্ত মহিলাদের সংস্থা Self Employed Women's Association (SEWA), Working Women's Forum (WWF), Muslim Women's Foum (MWF) প্রভৃতি। এইসব সংস্থার নেতৃত্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই পর্বে নারী সচেতনতা বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ আছে— প্রথমত, এই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের "পূর্ণ বিপ্লবের" ডাক নারী সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বহু মহিলা এই ডাকে সাড়া দিয়ে "নব নির্মাণ" কাজে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, জরুরী অবস্থার পর মানবাধিকার ও স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে ওঠে তাতে বহু মহিলা সংস্থা সামিল হয়। তৃতীয়ত, ভারতীয় নারী-মর্যাদা সংক্রান্ত কমিটির (Committee on Status of Women in India) প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার ফলে মহিলাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কিত নানা দৃষ্টান্ত জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। চতুর্থত, ১৯৭৫ সালটিকে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তীকালে ঐ দশকটিকে মহিলাদের জন্য উৎসর্গ করা হয়। ফলে সত্তরের দশকের শেষার্ধে সমগ্র বিশ্বজুড়ে মহিলাদের সমস্যাগুলির দিকে বিশেষ করে আলোকপাত করা হয়। স্বভাবতই এর প্রভাবে এদেশে বহু মহিলা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যেসব আন্দোলনে মহিলারা সামিল হোয়েছিলেন সেগুলি প্রধানত সমগ্র ভারতীয় সমাজ বা রাজনীতিকে ঘিরে সংগঠিত হোয়েছিল, কিন্তু সত্তরের দশকের পর যে আন্দোলনগুলিতে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন সেগুলির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাক্-স্বাধীনতা ও উত্তর-স্বাধীনতা পর্ব হিসাবে যদি নারী-আন্দোলনের ইতিহাসকে ভাগ করা যায় তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের আন্দোলনগুলি থেকে সত্তরের দশকের আন্দোলনগুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র।

স্বাধীনতার উত্তর পর্বে বিশেষ করে সত্তরের দশকে, যেসব আন্দোলনে মহিলারা সামিল হোয়েছেন, সেগুলির সবই যে সরাসরি নারী-আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তা নয়। কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন, যেমন—জয়প্রকাশ নারায়ণের "পূর্ণ বিপ্লব", নক্শাল, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ ইত্যাদি আন্দোলনগুলির সঙ্গে নারীর মর্যাদা ও বৈষম্যের প্রশ্ন জড়িত ছিল না, কিন্তু এইসব আন্দোলনে ব্যাপকভাবে মহিলারা অংশগ্রহণ করার ফলে মহিলাদের মধ্যে যে আত্মনির্ভরতার সৃষ্টি হোয়েছিল, পরবর্তীকালে নারী-আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা সাহায্য করেছিল। এদেশের পিতৃতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নারী-মর্যাদার অবমাননা ও নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি করার কাজে এই অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছে।

সত্তরের দশকে সংগঠিত মহিলা আন্দোলনের একটি তালিকা নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা যায় ঃ

(১) ১৯৭২ সালে আহমেদাবাদে ইলা ভাটের প্রচেষ্টায় নারীদের জন্য Self Employment Womens Association (SEWA) নামে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, সব মহিলারা অসংঘটিত ক্ষেত্রে কাজ করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান।

(২) ১৯৭২ সালে বোম্বাই শহরে মহিলারা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হন। এই প্রতিবাদের নিশানা হোল সরকারী ব্যবসায়ীরা এবং কালোবাজারীরা। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে জীবনযাত্রার মান নেমে যাওয়ার ফলে মহিলারাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই সহজেই তাঁরা প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হন। বোম্বাইয়ের পথে পথে মহিলারা স্টোভ, চামচ,

Scanned with CamScanner

থালা ইত্যাদি নিয়ে মিছিল করেন। সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের ঘেরাও করা হয়। এই আন্দোলন পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলাফল বিচার করে দেখার থেকেও বড়ো কথা হোল যে এই আন্দোলনের ফলে মহিলাদের এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সমবেত করা, সম্প্রদায় হিসাবে তাদের রাজনীতিকরণ ঘটানো এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হোয়ে উঠেছিল।

(৩) ১৯৭৩-৭৫ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য শহরেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মহিলারা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য আন্দোলনে সামিল হন। গুজরাটে এই আন্দোলন জয়প্রকাশ নারায়ণের পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের সাথে সংযুক্ত হোয়ে পড়ে। SEWA সংগঠনটি মহিলাদের প্রশিক্ষণ দান করা এবং ঋণ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা দান করার কাজে বিশেষ সাহায্য করে। এই মহিলা সংস্থার আন্দোলন দিল্লী, ভূপাল, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরের মহিলাদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

(৪) ১৯৭২ সালে উপজাতীয় মহিলারা মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ভিল উপজাতির মহিলারা এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনের একটি বিশেষত্ব হোল যে শুরুতে অহিংস গান্ধীবাদী নেতারা এর নেতৃত্বদান করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে হিংসাত্মক জঙ্গীবাদীরা নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। উপজাতীয় মহিলাদের প্রতি স্বামীরা যে নির্যাতন করতেন তার অন্যতম কারণ হিসাবে মদ্যপানকে চিহ্নিত করা হয়। মহিলা আন্দোলনকারীরা মদের দোকানগুলিতে প্রবেশ করে ভাঙচুর করেন এবং দোষী পুরুষদের প্রকাশ্যে শাস্তিদানের জন্য দাবী জানানো হয়।

(৫) ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে রেল শ্রমিকদের যে ধর্মঘট হয় তাতে বহু মহিলা শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জরুরী অবস্থা জারী করার পর যে বিক্ষোভ গড়ে ওঠে তাতেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। একথা অবশ্য মানতেই হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি, শুরুতে পরিবারের পুরুষেরা বা রাজনৈতিক দলের নেতারা মহিলাদের অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। পরের দিকে অবশ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং মহিলারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন মহিলা সম্মেলনের আয়োজন করা হোয়েছে যেখানে মহিলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহিলারা সোচ্চার হোয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মহারাষ্ট্রে আয়োজিত বিভিন্ন শিবিরের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে মদ্যপ স্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়।

(৬) ১৯৭৫ সালটিকে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ ও সত্তরের দশককে মহিলাদের দশক হিসাবে ঘোষণা করার ফলে বিশ্বজুড়ে মহিলাদের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ভারতেও তার প্রভাব দেখা যায়। বহু নতুন সংস্থা গড়ে ওঠে যেগুলি মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে সমস্ত সমস্যাগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান হোল—পণপ্রথা, ধর্ষণ, মহিলা শ্রমিকদের নানা অসুবিধা, পরিবারে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য, স্বামীদের হাতে স্ত্রীদের নির্যাতন, জেলখানায় মহিলা কয়েদীদের দুরবস্থা ইত্যাদি। ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ মহিলা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় এবং ত্রিভেন্দ্রাম, পুণে প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে ঐ দিনটিতে নানা সম্মেলনের আয়োজন করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

(৭) জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পরে সত্তরের দশকে মহিলা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। "মানুষী" নামে একটি পত্রিকার মাধ্যমে মহিলা সমস্যা সংক্রান্ত নানা তথ্য, পরিসংখ্যান,

Scanned with CamScanner

শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয়। দিল্লীর মহিলা সংস্থা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। মধু কিশওয়ার-এর পরিচালনায় এই পত্রিকা মহিলা আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া পুণের 'পুরগামী স্ত্রী সংগঠন', বোম্বাইয়ের "স্ত্রী মুক্তি সংগঠন", ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রগতিশীল মহিলা সংগঠন" প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবী স্বশাসিত গোষ্ঠীগুলি নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে। গোটা সত্তরের দশক জুড়ে নারী-আন্দোলনের অগ্রগতির উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা লক্ষ্মী লিনগমের ভাষায় বলা যায়, "the autonomous Women's Movements.....emerged in the early 1970s and blossomed in the wake of the internal emergency in 1975", অর্থাৎ সত্তরের দশকে স্বশাসিত নারী-আন্দোলনের যে উন্মেষ ঘটেছিল তা ১৯৭৫ সালের অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

(৮) আশির দশকে আরও কিছু মহিলা সংগঠন স্থাপিত হয় যার মধ্যে প্রধান হোল মহারাষ্ট্রের "সমগ্র মহিলা অঘাদি" সংস্থা। ঐ সময়ে উত্তরাখণ্ড নামে পৃথক রাজ্য সৃষ্টির জন্য যে সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তাতে "উত্তরখণ্ড মহিলা মঞ্চ"-এর নেতৃত্বে মহিলারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৪ সালে ভূপালে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস নির্গত হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে "ভূপাল গ্যাস পীড়িত মহিলা সংগঠন"-এর নেতৃত্বে মহিলারা আন্দোলনে সমবেত হন। এইসব দৃষ্টান্ত নারী-কল্যাণের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হোলেও এগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের লিপ্ত হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(৯) সত্তর ও আশির দশকে আয়োজিত নারী-আন্দোলন ও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অজস্র স্বশাসিত গোষ্ঠী ও সংস্থার চাপে রাজীব গান্ধী সরকার মহিলা উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ করে। অতঃপর, ১৯৯০ সালে মহিলা জাতীয় কমিশন আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৯২ সাল থেকে এই কমিশন কাজ শুরু করে। মূলত চারটি উদ্দেশ্যে এই কমিশন স্থাপিত হয়—(১) মহিলাদের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা, (২) মহিলাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনগুলির পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সুপারিশ করা, (৩) মহিলাদের মানবাধিকার লঙঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং (৪) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা। এই আইনে বলা হয় যে, এই কমিশনের সুপারিশগুলি কতদূর কার্যকর করা হোয়েছে সে ব্যাপারে সংসদে তথ্যাদি পেশ করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বাধ্য থাকবে।

১৯৯২-৯৩ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪ তম সংশোধনী আইনে মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোয়েছে। পঞ্চায়েতে মহিলারা অধিক সংখ্যায় আসার সুযোগ পাওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যরা নারী নির্যাতন নিয়ে আন্দোলন করেছেন। আগে নারী নির্যাতন ঘটনার নিষ্পত্তি করতেন সাধারণত গ্রামের মোড়ল এবং পুরুষ সমাজপতিরা। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চায়েত সদস্যারা মহিলা নির্যাতন প্রতিরোধে ও অপরাধীকে শাস্তিদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিভিন্ন রাজ্যের শহরে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মহিলাদের ভূমিকা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

Scanned with CamScanner

২০০১ সালটিতে ভারত সরকার নারীর ক্ষমতায়নের বর্ষ বলে ঘোষণা করেছে। নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ২০০৪ সালে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলি, UPA সরকারের সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত মহিলা কল্যাণের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হোল—(১) মহিলা সংরক্ষণ বিলটির প্রণয়ন, (২) কৃষি জমির ক্ষেত্রে মহিলাদের মালিকানা দান করার অধিকারকে বাস্তবায়িত করা, (৩) দরিদ্র গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা, (৪) পারিবারিক জীবনে মহিলারা যেসব হিংসাত্মক কার্যকলাপের শিকার হন তা প্রতিরোধের জন্য রচিত বিলে মহিলা সংগঠনগুলি কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনগুলির অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি।

নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে বিচারবিভাগের ভূমিকাও প্রশংসার দাবী রাখে। সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্তে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। এই প্রসঙ্গে শাহ্‌বানু মামলার কথা স্মরণ করা যায়। তাছাড়া সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলাদের দাবী, কর্মস্থলে মহিলাদের মর্যাদা রক্ষা করা, বিধবা মহিলাদের সম্পত্তি লাভের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আদালত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যেসব অশোভন আচরণের শিকার হন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য বিভিন্ন অফিসে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগের জন্য সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ দান করেছে এবং বলা হোয়েছে যে, এই কমিটির প্রধান হিসাবে একজন মহিলা থাকবেন। তাছাড়া কমিটির সদস্যদের মধ্যে বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নারী-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিক ও আইনী ব্যবস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এদেশে নারী-আন্দোলন শক্তিশালী হোয়ে উঠেছে। বর্তমানে কোনো কোনো গবেষক আবার পুরুষদের উপর অন্যায়ভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হোচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। পণপ্রথা সংক্রান্ত আইনের অপব্যবহারের দৃষ্টান্তও দেখা গেছে।

এদেশে নারী-আন্দোলনগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে নানা মত দেখা যায়। কল্পনা শাহ নারী-আন্দোলনের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা হোল— (১) প্রগতিবাদী নারীবাদ (Radical Feminism), (২) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism) এবং মধ্যপন্থী নারীবাদ (Moderate Feminism)। জে. এম. এভারেট আবার নারী-আন্দোলনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন —(১) সমিতিবদ্ধ নারীবাদ (Corporate Feminism) ও (২) উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism) । কিছু কিছু নারী-আন্দোলনকে আবার পরিবেশ সংক্রান্ত আন্দোলন এবং মানবাধিকার আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন, চিপকো আন্দোলনে মহিলাদের অবদান ছিল অপরিসীম। কিন্তু মূলত পরিবেশ আন্দোলনের নিদর্শন হিসাবেই চিপকো আন্দোলনকে বিবেচনা করা হয়।

নারী-আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য সত্ত্বেও নারী সমস্যার পূর্ণ সমাধান আজও হয়নি। গ্রামাঞ্চলে বহু স্থানে আজও অশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলারা মুক্তির আলো দেখেননি। ভারতীয় সমাজে আদিবাসী মহিলারা এখনও নির্যাতনের শিকার। অনেক ক্ষেত্রে নারী-কল্যাণের সমস্যাটি সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়নের সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে বলে মনে করা হয়।

Scanned with CamScanner